অধ্যায় ১০

জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি

অধ্যায় ১০ জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে :

- ☑ জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস
- ☑ উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি
- ☑ প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি
- ☑ প্রাণিজগতের শ্রেণিভিত্তিক শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ও তাদের উদাহরণ
- ☑ কীটপতঙ্গ
- ☑ স্তন্যপায়ী প্রাণী
- ☑ প্রানিজগতে মানুষের অবস্থান

10.1 জীবের শ্রেণিবিন্যাস

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই জীবজগৎ বৈচিত্র্যময়। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় 87 লক্ষ প্রজাতির জীব বাস করে, শুধু তাই নয় প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন জীব আবিষ্কৃত হচ্ছে। নানা ধরনের জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে জীবজগতে বৈচিত্র দেখা যায় আবার সকল জীব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই জীবজগতের অবদান অসীম। এসব জীবে রয়েছে নানা ধরনের ভিন্নতা, এদের গঠন ভিন্ন, আবাসস্থল ভিন্ন, কেউ উপকারী আবার কেউ অপকারী। এ কারণে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের সুসংবদ্ধ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা এই বিশাল সংখ্যক জীবদের শত শত বৎসর থেকে শ্রেণিবিন্যাস করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সঠিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা থাকলে তার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহজে, স্বল্প পরিশ্রমে ও কম সময়ে পৃথিবীর সকল প্রজাতি সম্বন্ধে জানা যায়। নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতেও শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জীবের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন তথ্য এবং উপাত্ত পাওয়া যায় এবং ধীরে ধীরে তাদের মাঝে যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

একসময় ধারণা করা হতো পৃথিবীর জীবকুল উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুই রাজত্বে বিভক্ত। কিন্তু যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকে বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে অনুভব করতে শুরু করেন যে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য শুধু উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুইটি রাজত্ব যথেষ্ট নয়। যেমন : ছত্রাক উদ্ভিদ থেকে যথেষ্ট ভিন্ন, এর মাঝে ক্লোরোফিল নেই এবং উদ্ভিদের মতো নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না, তাই ছত্রাককে

একটি আলাদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর অণুজীবের একটি বিশাল জগৎ আবিষ্কৃত হয় এবং বিজ্ঞানীরা কোষের গঠন সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই এককোষী জীবের জন্য একটি ভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এককোষী জীবদের মাঝেও কোষের গঠনের উপর নির্ভর করে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ রয়েছে। একটি প্রোক্যারিওট (জীবকোষে অগঠিত নিউক্লিয়াস) এবং অন্যটি ইউক্যারিওট (জীবকোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস)। সে কারণে প্রোক্যারিওট এককোষীদের জন্য মনেরা এবং ইউক্যারিওট এককোষীদের জন্য প্রোটিস্টা নামে দুইটি ভিন্ন রাজ্যতে ভাগ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন মনেরা রাজ্যের প্রোক্যারিওট এককোষী প্রাণীদের মাঝে আর্কিব্যাক্টেরিয়া এবং ইউব্যাক্টেরিয়া নামে দুইটি সুস্পষ্ট বিভাজন আছে এবং তারা এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাই বর্তমানে মনেরার পরিবর্তে আর্কিব্যাক্টেরিয়া এবং ইউব্যাক্টেরিয়া নামে দুইটি ভিন্ন রাজ্যের কথা বলা হয়। কাজেই জীবজগতকে সব মিলিয়ে প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক, প্রোটিস্টা, ইউব্যাক্টেরিয়া এবং আর্কিব্যাক্টেরিয়া এই ছয়টি রাজ্যে ভাগ করা হলে সকল জীবকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করা সম্ভব।

জীবজগতের শ্রেণিবিভাগের জন্য নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয়।

- ☑ 1। কোষের সংখ্যা (এককোষী নাকি বহুকোষী)
- ☑ 2। কোষের ধরন (প্রোক্যারিওটিক নাকি ইউক্যারিওটিক)
- ☑ 3। পুষ্টির ধরন (স্বভোজী নাকি পরভোজী)

একইসঙ্গে জিনেটিকসের অগ্রগতি হতে থাকে এবং জীবদের জিনেটিক গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ইউকেরিয়া, ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কি এই তিনটি তিনটি ডোমেইন বা অধিজগতে ভাগ করা হয়। পাশের ছবিতে ছয়টি রাজ্য বিবর্তিত হয়ে তিনটি ডোমেইনে কীভাবে বিভক্ত করা হয়েছে সেটি দেখানো হয়েছে।

জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস, রাজত্ব এবং ডোমেইনে বিভাজন

নিচে ছয়টি রাজ্যের সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে জীবজগৎ এত বৈচিত্র্যময় যে উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে অনেক ব্যতিক্রম পাওয়া

যায়। যেমন—প্লাটিপাস নামে একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যেটি ডিম পারে, ঘোস্ট প্লান্ট নামে উদ্ভিদ আছে যেখানে ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, কেল্প নামে প্রোটিস্টা আছে যেটি বিশাল এলাকা জুড়ে থাকে, সী স্লাগ নামে প্রানির একধরণের প্রজাতি আছে যারা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে-ইত্যাদি।

প্রাণী

এটি সর্ববৃহৎ রাজ্য, এখানে প্রায় 10 লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। এটি বহুকোষী, ইউক্যারিওটিক, চলতে সক্ষম, পরভোজী এবং যৌন প্রজনন দিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদ

উদ্ভিদের প্রায় 2.5 লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। এটিও বহুকোষী, ইউক্যারিওটিক এবং স্বভোজী। উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে এবং সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে নিজের খাবার তৈরি করে এবং জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্য সরবরাহ করে। শুধু তাই নয় উদ্ভিদ অক্সিজেন সৃষ্টি করে জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখে।

ছত্রাক

ছত্রাকের প্রায় 1.5 লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। এগুলো সাধারণত বহুকোষী, ইউক্যারিওটিক এবং পরভোজী জীব। পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে ছত্রাক পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করে পরিবেশ রক্ষা করে।

প্রোটিস্টা

বেশিরভাগ প্রোটিস্টা এককোষী, ইউক্যারিওটিক এবং পরভোজী। প্রোটিস্টা প্রাণী সদৃশ, উদ্ভিদ সদৃশ কিংবা ছত্রাক সদৃশ হতে পারে।

ইউব্যাক্টেরিয়া

ইউব্যাক্টেরিয়া প্রোক্যারিওট এককোষী এবং পরভোজী। এরা বাইনারি ফিশান বা অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে অযৌন প্রজনন করে থাকে। এরা মানুষকে রোগাক্রান্ত করতে পারে।

আর্কিব্যাক্টেরিয়া

আর্কিব্যাক্টেরিয়া প্রোক্যারিওটিক, এককোষী এবং আদিব্যাক্টেরিয়া। উষ্ণ প্রস্রবণ, সমুদ্রের গভীরে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, অতি লবণাক্ত স্থান এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও আর্কিব্যাক্টেরিয়া পাওয়া গেছে। এরা মানুষকে রোগাক্রান্ত করতে পারে না। যেহেতু এগুলো ব্যাকটেরিয়া থেকে অনেক ভিন্ন সেজন্য অনেক সময় এদের শুধু আর্কিয়া বলা হয়।

তোমরা সবাই জানো , উপরে উল্লেখিত এই ছয়টি রাজ্য ছাড়াও অকোষীয় (noncellular) অণুজীবের আরেকটি বড়ো জগত রয়েছে। জীবজগতের বাইরে জীব ও জড়ের মাঝমাঝি এই অণুজীবের একটি উদাহরণ হচ্ছে ভাইরাস।

আগের শ্রেণিতে তোমরা ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এবং প্রোটিস্টা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ, এই অধ্যায়ে তোমরা উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানবে।

10.2 উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি

উদ্ভিদের নানা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিন্যাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—আমাদের চারপাশে কিছু কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায় যাদের জীবনকাল এক বছর আবার তাদের পাশাপাশি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদও দেখা যায়। অনেক উদ্ভিদ ফুল ধারণ করে, আবার অনেক উদ্ভিদ ফুলহীন। উদ্ভিদের আকার আকৃতিতেও রয়েছে অনেক পার্থক্য। খাদ্য প্রস্তুত ও গ্রহণেও উদ্ভিদের নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণে জর্জ বেনথাম (1800-1884) এবং স্যার জোসেফ ডালটন হুকার (1817-1911) নামক দুজন ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রস্তাব করেছিলেন। তাদের ল্যাটিন ভাষায় রচিত এবং তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'জেনেরা প্ল্যান্টেরাম' (Genera Plantarum) নামক বইতে প্রথম উদ্ভিদের এই প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে বেনথাম ও হুকারের প্রস্তাবিত উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করা হলো। তারা সমস্ত উদ্ভিদজগৎকে অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ এই দুটি উপজগতে ভাগ করেন।

10.2.1 অপুষ্পক উদ্ভিদ (Cryptogamae)

যে সকল উদ্ভিদে কখনো ফুল হয় না তারাই অপুষ্পক উদ্ভিদ। রেণু বা স্পোরের দ্বারা এদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে অপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

1। সমাঙ্গবর্গ
2। মসবর্গ
3। ফার্নবর্গ

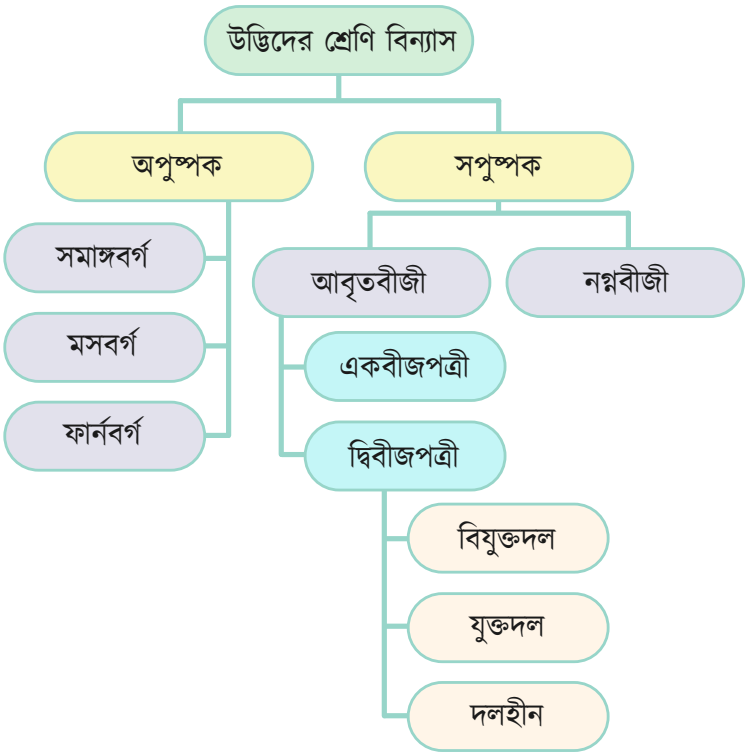

1। সমাঙ্গবর্গ (Thallophyta) :

যে সকল উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় ভাগ করা যায় না সে সকল উদ্ভিদকে এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের কোনো পরিবহণ তন্ত্র নেই। জননাঙ্গ সাধারণত এককোষী। সমাঙ্গবর্গ উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার।

2। মসবর্গ (Bryophyta) : এই বর্গের উদ্ভিদরা নরম কাণ্ড ও পাতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এদের

দেহে মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড নামক মূল রোমের মতো ফিলামেন্ট থাকে এবং এর মাধ্যমেই এরা মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে। এদের দেহে কোনো পরিবহণ তন্ত্র দেখা যায় না। মসবর্গীয় উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় তেইশ হাজার।

3। ফার্নবর্গ (Pteridophyte) : ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এদের দেহে পরিবহণ রয়েছে। ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদের মোট প্রজাতির সংখ্যা দশ হাজার।

10.2.2 সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogamae):

যে সকল উদ্ভিদের ফুল (এবং বীজ) হয় তারাই এই উপজগতের অন্তর্ভুক্ত। বীজের মাধ্যমেই এরা বংশবিস্তার করে থাকে। যেমন—পাইন, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি বীজযুক্ত উদ্ভিদের উদাহরণ। এই উপজগৎ দুই ভাগে বিভক্ত :

1) নগ্নবীজী উদ্ভিদ
2) আবৃতবীজী উদ্ভিদ

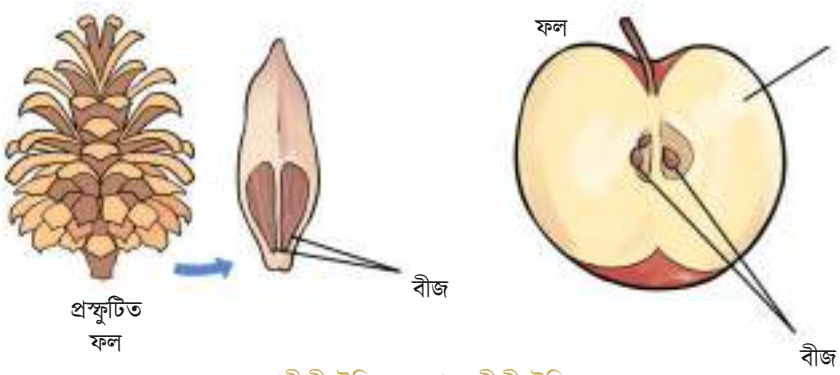

নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ

1) নগ্নবীজী উদ্ভিদ (Gymnospermae) : এই বিভাগের উদ্ভিদের ফুলের স্ত্রীস্তবকে গর্ভাশয় থাকে না, তাই এদের ফল তৈরি হয় না। গর্ভাশয় না থাকায় বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে, যার ফলে এদেরকে নগ্নবীজি উদ্ভিদ বলে। নগ্নবীজী উদ্ভিদের সাইকাস, পাইনাস প্রভৃতি নগ্নবীজী উদ্ভিদের উদাহরণ।

2) আবৃতবীজী উদ্ভিদ (Angiospermae) : এসব উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় আছে, তাই ফল তৈরি হয় এবং বীজ ফলের ভেতরে আবৃত থাকে। বীজে বীজপত্রের উপর ভিত্তি করে এই বিভাগকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে—

ক) একবীজপত্রী উদ্ভিদ
খ) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ

ক) একবীজপত্রী উদ্ভিদ (Monocotyledons) : যে সকল উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে সেগুলোকে একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে। এদের মূল হয় গুচ্ছমূল জাতীয় এবং পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস থাকে। কাণ্ডে পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ ক্যাম্বিয়ামবিহীন ও বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো। পৃথিবীতে প্রায় 18000 একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রজাতির রয়েছে। ধান, গম, কলা, কচু , নারিকেল ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ।

খ) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (Dicotyledons) : যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে সেগুলোকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা সাধারণত জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত হয়ে থাকে এবং একটি প্রধান মূল থেকে শাখা-প্রশাখা মূল বের হয়ে মূলতন্ত্র গঠন করে। এসকল উদ্ভিদের কাণ্ডে পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ ক্যাম্বিয়ামযুক্ত ও বৃত্তাকারে সাজানো। কাঁঠাল, লিচু, রাই সরিষা, ধুতুরা ইত্যাদি হচ্ছে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ। পৃথিবীতে প্রায় 80 হাজার দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ রয়েছে। ফুলের পাপড়ির উপস্থিতি, অনুপস্থিতি এবং সংযুক্তির উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিকে আবার তিনটি উপ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে —

ক) বিযুক্তদল উদ্ভিদ
খ) যুক্তদল উদ্ভিদ
গ) দলহীন উদ্ভিদ

বিযুক্তদল উদ্ভিদ, যুক্তদল উদ্ভিদ এবং দলহীন উদ্ভিদ

ক) **বিযুক্তদল উদ্ভিদ (Polypetalae) :** এ জাতীয় উদ্ভিদের ফুলের পাপড়ি পৃথক বা সংযুক্ত থাকে না। যেমন— সরিষা।

খ) **যুক্তদল উদ্ভিদ (Gamopetalae) :**

এ জাতীয় উদ্ভিদের ফুলের পাপড়ি পরস্পর যুক্ত অবস্থায় থাকে, যেমন— ধুতুরা।

গ) **দলহীন (Monochlamydae) :** এ সকল উদ্ভিদের ফুলে পাপড়ি দেখা যায় না। যেমন— কাঁঠাল।

এখানে উল্লেখ্য যে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের জৈব রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা হওয়ার কারণে জেনেটিক্স এবং বিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্ভিদের নতুন ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করার কাজ শুরু হয়েছে।

10.3 প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি

প্রাণিজগৎ একটি সুবিশাল রাজ্য, এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এদেরকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করার চেষ্টা করা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর প্রাণিকুলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে, আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে বিভিন্নভাবে এই প্রাণীরা নিজেদের অভিযোজিত করেছে। ফলে অসম্ভব বৈচিত্র্যময় যে প্রাণিজগৎ আমরা এখন

দেখতে পাই তাদেরকে হাতেগোনা কয়েকটা পর্বে ভাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদও আছে।

সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707 (1798-প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুসংবদ্ধ উপায়ে প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস করেন। তিনি তাঁর Systema Naturae বইয়ের দশম সংস্করণে সর্বপ্রথম দ্বিপদ নামকরণের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাই পরবর্তীকালে শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন হওয়ার পরেও তাঁকে শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যার জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

10.3.1 প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর এ পর্যন্ত শনাক্তকৃত সকল প্রাণীকে তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়টি বড়ো পর্বে ভাগ করা হয়েছে। যে সকল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণীর এই শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য (Taxonomic characteristics) বলা হয়। প্রথমেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে একটু জেনে নেয়া যাক।

কয়েকটি প্রধান শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

1. কোষের বিন্যাস

বিভিন্ন প্রাণীর গঠনের বিন্যাস অনুযায়ী তাদের আলাদা করা যায়। অপেক্ষাকৃত আদিম ও সরল বহুকোষী প্রাণী, যেমন—স্পঞ্জের গঠন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এদের শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয় কোষীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ কোষগুলো অবিন্যস্ত থাকে এবং আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে। এর চাইতে একটু জটিল প্রাণী, যেমন—জেলিফিশের ক্ষেত্রে কোষগুলো একত্র হয়ে কলা বা টিস্যু হিসেবে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়। এর চেয়ে জটিলতর প্রাণীর ক্ষেত্রে একাধিক টিস্যু বা কলা মিলে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য অঙ্গ গঠন করে। মানুষ বা অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই কলা বা টিস্যুগুলো শুধু যে সুসংবদ্ধ হয়ে অঙ্গ তৈরি করে তাই নয়, একাধিক অঙ্গ আবার একসঙ্গে মিলে এক একটা তন্ত্র গঠন করে, যা আবার সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পন্ন করে।

2. দেহের প্রতিসাম্য (Symmetry)

দেহের প্রতিসাম্যের ভিত্তিতে প্রাণীদের আলাদা করা যায়। কোনো কোনো প্রাণী একেবারে অপ্রতিসম, যেমন স্পঞ্জ। এদের দেহকে হুবহু একই রকম একাধিক অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। আবার তেলাপোকা, পাখি বা মানুষকে লম্বালম্বি হুবহু একইরকম দুভাগে ভাগ করা সম্ভব। , এই প্রাণীরা দ্বি-পার্শ্বীয়

প্রতিসাম্যবিহীন বা অপ্রতিসম স্পঞ্জ , দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম মাছি এবং অরীয় প্রতিসাম্যযুক্ত তারা মাছ

প্রতিসম। আবার তারামাছ, জেলিফিশ ইত্যাদি বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের দেহকে চার, পাঁচ বা আরও বেশি অভিন্ন অংশে বিভক্ত করা সম্ভব। এদের প্রতিসাম্যের ধরন হলো radial বা অরীয় প্রতিসাম্য।

3. দেহগহ্বর বা সিলোম (coelom)

প্রাণিদেহে বিশেষভাগে গঠিত দেহগহ্বর আছে কি নেই, থাকলে এর গঠন কেমন সেটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এর ওপর ভিত্তি করেও বিভিন্ন প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ করা হয়। প্রাণিদেহে এই বিশেষ দেহগহ্বরের ভূমিকা অনেক। এই গহ্বর বা সিলোমে দেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অঙ্গ (বিশেষ করে পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গসমূহ) একত্র হয়ে আবদ্ধ থাকে। এর ফলে এই অঙ্গসমূহ যেমন সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। এই দেহগহ্বরের ভেতরে অঙ্গসমূহ এক ধরনের তরলে নিমজ্জিত থাকে বলে বাইরের চাপ বা ধাক্কা থেকেও সেগুলো সুরক্ষিত থাকে। প্রবাল বা ফিতাকৃমির মতো সরল জীবসমূহের শরীরে সুগঠিত দেহগহ্বর দেখা যায় না, অন্যদিকে মানুষসহ অন্য জটিলতর জীবে বা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

৪. দেহখণ্ডের উপস্থিতি

কোনো কোনো প্রাণীর দেহ একাধিক খণ্ডে বিভক্ত থাকে, যেমন—কীট পতঙ্গের দেহ তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু মাকড়শার দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত। অনেক ক্ষেত্রে এরকম একাধিক খণ্ডে আবার একই অঙ্গের ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। প্রাণীর শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে এটাও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

5. কঙ্কালতন্ত্রের ধরন

কোনো প্রাণীর কঙ্কালতন্ত্র আছে কি নেই, থাকলে তার ধরন কেমন—শ্রেণিবিন্যাস করার সময় এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। কোনো কোনো প্রাণীর দেহের ভেতরে সুগঠিত কঙ্কালতন্ত্র থাকে, যেমন—মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী। আবার কোনো কোনো প্রাণীর দেহের ভেতরে এরকম কঙ্কাল না থাকলেও দেহের বাইরে বহির্কঙ্কাল দেখা যায়, যেমন—শামুক বা কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী। আবার কচ্ছপের মতো ব্যতিক্রমী উদাহরণও আছে যার অন্তঃকঙ্কাল, বহির্কঙ্কাল দুটিই আছে।

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর বাইরে খাদ্য পরিপাকের প্রক্রিয়া, দেহের সংবহন প্রক্রিয়া, প্রজননের ধরন—ইত্যাদিও প্রাণিকুলের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

10.3.2 প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় অ্যানিম্যালিয়া রাজ্যের সকল প্রাণীদের নয়টি মূল পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই নয়টি পর্বের প্রথম আটটি পর্বের প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী এবং শেষ পর্বের প্রাণীরা সাধারণত মেরুদণ্ডী। এখন খুব সংক্ষেপে এই নয়টি পর্বের প্রাণীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পর্ব 1: পরিফেরা (Porifera)

পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের প্রাণিজগতের সবচেয়ে সরল ও আদিম সদস্য বলা চলে। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত সদস্য হচ্ছে স্পঞ্জ। এই প্রাণীদের উদ্ভব সামুদ্রিক পরিবেশে, পৃথিবীর সকল সমুদ্রে এবং কিছু মিঠা পানির জলাশয়েও এদের দেখা যায়। বহুকোষী হলেও এদের গঠন অতি সরল। এদের দেহের কোষগুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, সুবিন্যস্ত হয়ে নির্দিষ্ট টিস্যু গঠন করতে বা অঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারেনা।

Porus শব্দের অর্থ ছিদ্র এবং ferre শব্দের অর্থ বহন করা, এই দুই মিলে পরিফেরা। এই পর্বের প্রাণীদের দেহে অসংখ্য ছিদ্র এবং নালিকা আছে, যেগুলোর মাধ্যমে ক্রমাগত এদের দেহের ভেতরে পানি প্রবাহিত হয়; আর এই প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পানি থেকে খাদ্যকণা ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দেহের বর্জ্য বাইরে বের করে দেয়। পানি প্রবেশ করার জন্য এদের দেহপ্রাচীরের যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে যেগুলোকে অস্টিয়া (Ostia) বলে। ভেতরের প্রকোষ্ঠটি কোয়ানোসাইট নামে সূক্ষ্ম চুলের মতো ফ্লাজেলা যুক্ত বিশেষ কোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। কোয়ানোসাইটগুলো তাদের ফ্লাজেলা ক্রমাগত নাড়িয়ে ভেতরে একধরনের পানির প্রবাহ তৈরি করে এবং পানি উপরের গর্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়েই কোয়ানোসাইট পানি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।

পরিফেরা পর্বের প্রাণী স্পঞ্জ

এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

গঠন ও কোষের বিন্যাস : বহুকোষী হলেও কোষগুলো সুবিন্যস্ত নয় তাই এদের সুনির্দিষ্ট টিস্যু কিংবা অঙ্গ নেই। তাই এই পর্বের প্রাণীদের বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন হয় কোষীয় পর্যায়ে।

দেহের প্রতিসাম্য : অপ্রতিসম।

দেহগহ্বর: নেই।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন: অন্তঃকঙ্কাল রয়েছে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: সাধারণত প্রাণিমাত্রই আমরা চলাচলে সক্ষম ধরে নিই। কিন্তু পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা প্রায় সবাই পূর্ণবয়সে পৌঁছার আগেই চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। লার্ভা অবস্থায় এরা চলনক্ষম থাকলেও পরিণত বয়সে এরা সমুদ্রের কঠিন তলদেশে স্থায়ীভাবে আটকে থাকে।

পর্ব 2 : নিডেরিয়া (Cnidaria)

নিডারিয়া পর্বের প্রাণীরা পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রাণী। এই পর্বের প্রাণীদের কোষসমূহ টিস্যু বা কলা তৈরি করে কাজ করতে পারে, তবে এদেরও সুনির্দিষ্ট অঙ্গ নেই।

দেহের ভেতরে সিলেন্টেরন নামে একটি প্রশস্ত গহ্বর থাকে যার ভেতরে খাদ্য পরিপাক ও পরিবহণ ঘটে। (তবে এই গহ্বর সিলোম বলতে তোমরা যে দেহগহ্বরের কথা জেনেছ সেটি নয়।) সিলেন্টেরনের ভেতরে আলাদা করে কোনো পরিপাক অঙ্গ থাকে না, বরং খাদ্য এই গহবরে পৌঁছার পর এর প্রাচীরের কোষের সাহায্যে সেখান থেকে পুষ্টি শোষিত হয়। একটিমাত্র মুখছিদ্র থাকলেও এই পর্বের প্রাণীদের আলাদা করে কোনো পায়ুপথ নেই। সাধারণত মুখের আশপাশে শিকার ধরার জন্য শুঁড়ের মতো টেন্ট্যাকল থাকে।

নিডেরিয়া পর্বের প্রাণী জেলিফিশ

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক,

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক কোষের সমন্বয়ে টিস্যু থাকলেও নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট অঙ্গ নেই।

দেহের প্রতিসাম্য : অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর : নেই।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : হাড়ের তৈরি দৃঢ় কঙ্কালতন্ত্র নেই। তবে সিলেন্টেরন নামক গহ্বর পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে যা দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : তবে নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহত্বকে নিডোব্লাস্ট (Cnidoblast) নামক কোষ থাকে, এর সাহায্যে এরা সকলেই বিষাক্ত হুল বা কাঁটা ছুড়ে শিকার করতে বা আত্মরক্ষা করতে পারে। তাই এই পর্বের নামটাও এসেছে গ্রিক Knide অর্থ রোমকাঁটা এবং aria অর্থ সংযুক্ত থেকে। এই পর্বের প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—জেলিফিশ, প্রবাল, হাইড্রা ইত্যাদি।

পর্ব 3: প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes)

প্লাটিহেলমিনথেস নামটা কঠিন মনে হলেও এই পর্বের প্রাণীও আমাদের খুব অপরিচিত নয়। চ্যাপ্টা বা ফিতা কৃমি এই পর্বের প্রাণী তাই প্লাটিহেলমিনথেস নামটিও এসেছে গ্রিক platy অর্থ চ্যাপ্টা এবং helminthes অর্থ কৃমি থেকে। এদের গঠন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের তুলনায় অনেক অনেক সরল হলেও আগের পরিফেরা এবং এনিলিডা পর্বের প্রাণীদের থেকে কিছুটা জটিল। এই পর্বের প্রাণীরা অনেক ক্ষেত্রেই পরজীবী, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর দেহের ভেতরে বাস করে। স্বাধীনভাবে বাস করে এমন প্রাণীও আছে, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জলাশয়ে বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে বাস করে। এই পর্বের প্রাণীদের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার থেকে শুরু করে প্রায় 20 মিটার (66 ফুট) পর্যন্ত হতে পারে!

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : কিছু কিছু তন্ত্র গঠিত হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে চলন ও রেচনের মতো শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়। শ্বসনতন্ত্র ও বদ্ধ সংবহনতন্ত্র নেই। পেশিতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র থাকলেও পূর্ণাঙ্গ পরিপাকতন্ত্র গঠিত হয়নি। এদের দেহের পেশিগুলো স্তরে স্তরে ও গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর: নেই।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : নেই।

পর্ব ৫ : নেমাটোডা (Nematoda)

গ্রিক nema শব্দের অর্থ সুতা। এই পর্বের প্রাণীরা নলাকার, সরু ও লম্বা হয়ে থাকে। চ্যাপ্টা বা ফিতাকৃমির সাথে এদের পার্থক্য হলো এদের এই নলাকার গঠন; আর এই গঠন স্থায়ীত্ব পায় এদের দেহের ভেতরে থাকা গহবরের জন্য। গহবরের ভেতরে পানিপূর্ণ থাকার কারণে তা এদের গঠনকে দৃঢ়তা প্রদান করে ও কঙ্কালের মতো কাজ করে। এদের দেহে পরিপাকনালি রয়েছে, এর গঠন সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বের প্রাণীরাও অনেক ক্ষেত্রেই পরজীবি, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর দেহের ভেতরে বাস করে। যেমন—হুকওয়ার্ম এই পর্বের একধরনের কৃমি, এরা মানুষের অন্ত্রে বাস করে। এদের দেহ পুরু কিউটিকল নামক পদার্থ দিয়ে আবৃত থাকে। ফলে পোষক দেহের পরিপাকনালির ভেতরে থাকলেও পরিপাকনালির যে তীব্র পাচক রস বা এনজাইম, তাতে এদের কোনো ক্ষতি হয় না। স্বাধীনভাবে বাস করে এমন প্রাণীও আছে, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিঠা পানির পরিবেশে বাস করে। এই পর্বের প্রাণীদের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার থেকে শুরু করে প্রায় 7 মিটার (23 ফুট) পর্যন্ত হতে পারে।

এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

গঠন ও কোষের বিন্যাস : সরল তবে মুখ ও পায়ুপথ সহ পূর্ণাঙ্গ পরিপাকতন্ত্র আছে। তন্ত্রের মাধ্যমে পরিপাক, রেচন ও চলনের মতো শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়। তবে ফিতাকৃমিদের মতো এদেরও শ্বসনতন্ত্র ও বদ্ধ সংবহনতন্ত্র নেই।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর: সুগঠিত সিলোম বা দেহগহ্বর না থাকলেও ছদ্মসিলোম (pseudo-coelom) রয়েছে। এর ভেতরে পরিপাকতন্ত্রের অবস্থান।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : হাড়ের তৈরি কঙ্কালতন্ত্র নেই। তবে দেহ গহ্বরের ভেতরে পানিপূর্ণ থাকায় তা দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

পর্ব 5 : অ্যানিলিডা (Annelida)

কেঁচো বা জোঁকের শরীরের গঠন কেমন কখনো খুব ভালো করে খেয়াল করেছ? লক্ষ করলে দেখবে এই প্রাণীদের সারা শরীর অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত, মনে হয় যেন অনেকগুলো ক্ষুদ্র আংটি পর পর জোড়া দিয়ে শরীরটা তৈরি। ঠিক এই কারণেই কেঁচো ও এই ধরনের প্রাণীদের নিয়ে যে পর্ব গঠিত তার নাম রাখা হয়েছে 'অ্যানিলিডা', এই শব্দটা এসেছে ল্যাটিন annulus থেকে যার অর্থ হচ্ছে আংটি। এই পর্বের প্রাণীদের দেহের গঠন লম্বা নলাকৃতির। প্রায় ক্ষেত্রেই এই প্রাণীদের দেহে চুলের মতো শক্ত লোম বা সিটি (setae) থাকে যা তাদের চলনে সাহায্য করে।

অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণী জোঁক

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর : সত্যিকারের দেহগহ্বর আছে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি আছে।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : হাড়ের তৈরি দৃঢ় কঙ্কালতন্ত্র নেই। তবে দেহাভ্যন্তরে তরলে পূর্ণ গহ্বর থাকে যা দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে।

পর্ব 6 : আর্থোপোডা (Arthropda)

আর্থোপোডা শব্দটা এসেছে গ্রিক arthro ও poddos থেকে, যার অর্থ হলো যথাক্রমে 'সন্ধি' ও 'পা'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই পর্বের প্রাণীদের সন্ধিযুক্ত পা থাকে। আর্থোপোডা প্রাণীরাজ্যের সর্ববৃহৎ পর্ব, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের 80% প্রাণীই এই পর্বের। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যত বৈচিত্র্যময় জীবের প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে তার বেশিরভাগই এই পর্বের, আর এই সংখ্যাটা 12 লক্ষেরও বেশি। সকল কীটপতঙ্গ (যেমন—তেলাপোকা, ফড়িং ইত্যাদি), অ্যারাকনিড (যেমন—মাকড়শা, বিছা, উকুন ইত্যাদি), এবং ক্রাস্টাসিয়ান (যেমন—কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি) এই পর্বের প্রাণী।

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর: দেহ গহ্বর থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেহগহ্বর রক্তে পূর্ণ থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : পুরো দেহ কয়েকটি বিশেষ খণ্ডে বিভক্ত থাকে।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : কাইটিন দিয়ে তৈরি বহির্কঙ্কাল বা খোলস রয়েছে। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কঙ্কালের বৃদ্ধি ঘটে না। কাজেই জীবনের বিভিন্ন সময়ে এরা এই কঙ্কাল মুক্ত করে দেয়, এবং নতুন করে তা আবার জন্মায়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে। এন্টেনা এবং চোখ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে পুঞ্জাক্ষি থাকে (যেমন—মাছি)।

পর্ব 7 : মোলাস্কা (Mollusca)

Molluscus শব্দ থেকে এই পর্বের নামকরণ, যার শাব্দিক অর্থই হলো 'নরম'। মোলাস্কা পর্বের প্রাণীদের দেখলেই এই নামের কারণ বোঝা যায়, আমাদের পরিচিত প্রাণীদের মধ্যে শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস ইত্যাদি এই পর্বের অন্তর্গত। এদের প্রত্যেকের দেহ নরম ও মাংসল। এদের প্রশস্ত মাংসল পা থাকে, এবং দেহ ম্যান্টেল (mantle) নামক পেশিযুক্ত আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। আর্থ্রোপোডার পরে মোলাস্কা দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব, এখন পর্যন্ত এই পর্বের এক লাখের বেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা মূলত নিশাচর, পৃথিবীর প্রায় সকল মিঠা ও লোনা পানির জলীয় পরিবেশে এদের দেখা যায়, তবে বেশ কিছু স্থলচর প্রজাতিও রয়েছে। এই পর্বের প্রাণীরা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, এগুলো নানা বর্ণ ও আকৃতির হয়ে থাকে; অতিক্ষুদ্র শামুক থেকে শুরু করে অতিকায় স্কুইড পর্যন্ত এই পর্বের অন্তর্গত।

মোলাস্কা পর্বের প্রাণী অক্টোপাস

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে সুগঠিত তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর : সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : অনেকেরই ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি শক্ত বহির্কঙ্কাল থাকে (যাকে আমরা ঝিনুক বা শামুকের খোলক হিসেবে দেখি) যা এদের নরম দেহকে সুরক্ষা দেয়। অনেকের আবার এরকম কঙ্কাল নেই, যেমন অক্টোপাস, স্কুইড, সী স্লাগ ইত্যাদি।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : সুস্পষ্ট মস্তিষ্ক বিদ্যমান। সুগঠিত স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণীর (যেমন—স্কুইড ও অক্টোপাস) স্নায়ুতন্ত্র অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক বিকশিত।

পর্ব ৪: একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

যথারীতি এই পর্বের প্রাণীদের ক্ষেত্রেও নামের অর্থ বুঝলেই বৈশিষ্ট্যগুলো আন্দাজ করা যায়। গ্রিক শব্দ echinos এর অর্থ হচ্ছে কাঁটা, আর derma শব্দের অর্থ হলো ত্বক। নাম দেখেই বুঝতে পারছ এই পর্বের প্রাণীদের দেহত্বক কাঁটা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। একাইনোডার্মাটা পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক পরিবেশে বাস করে। এদের আলাদা মাথা নেই। প্রধান যে বৈশিষ্ট্য এই পর্বের সকল প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় তা হলো অরীয় প্রতিসাম্য। এছাড়া এই পর্বের প্রাণীদের আরেকটা অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেটা হলো এদের সারা দেহে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত পানি সংবহন তন্ত্র। এই তন্ত্রের মাধ্যমে এদের শ্বসন, খাদ্যগ্রহণ ও রেচনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়। শুধু তাই নয়, এই তন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে অসংখ্য পেশিবহুল নলাকৃতির পা। এই নলগুলোতে পানির চাপ হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে এগুলোর সংকোচন-প্রসারণ ঘটে, আর এর মাধ্যমেই এই প্রাণীরা চলাচল করে। এই পর্বের প্রাণীর মধ্যে আছে স্টার ফিশ বা তারা মাছ, সি অর্চিন, সি কিউকাম্বার ইত্যাদি। এই প্রাণীরা দেখতে অতি বিচিত্র হলেও এই একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণীদের সঙ্গেই আমাদের কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের (মানুষও যেই পর্বের অন্তর্ভুক্ত) বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায়!

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক,

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে সুগঠিত তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : ভ্রূণ থাকা অবস্থায় এদের দেহে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়, তবে পূর্ণবয়স্ক প্রাণীদের দেহ অরীয় প্রতিসম।

দেহগহ্বর : সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি নেই।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : দেহের অভ্যন্তরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি অন্তঃকঙ্কাল থাকে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : সুগঠিত পানি সংবহনতন্ত্র রয়েছে যা বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে সহায়তায় করে। এদের অনেক প্রাণীর দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তা পুনর্গঠন করার ক্ষমতা আছে।

পর্ব ৭ : কর্ডাটা (Chordata)

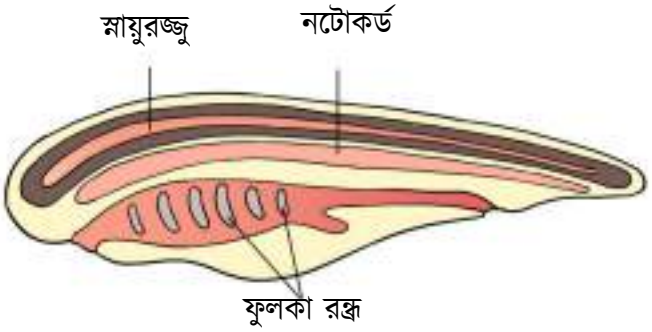

নটোকর্ড এবং নার্ভকর্ড

প্রাণিজগতের সকল পর্বের মধ্যে এই কর্ডাটা পর্বের সাথেই আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত, কারণ আমরা নিজেরা, অর্থাৎ মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি, কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণীই কিন্তু মেরুদণ্ডী নয়। chorda শব্দের মানে হলো রজ্জু বা নালি। এই পর্বের সকল প্রাণীর দেহে পিঠ বরাবর লম্বালম্বি একটি নালি দেহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, একে বলা হয় নটোকর্ড (Notochord)। এটি নিরেট ও দণ্ডাকৃতির। আর এই নটোকর্ডের ঠিক উপরে সমান্তরালভাবে আরেকটা দণ্ডাকৃতির নালি থাকে, এটি হলো স্নায়ুরজ্জু বা নার্ভকর্ড। তবে এটি নটোকর্ডের মতো নিরেট নয়, বরং ফাঁপা নলের মতো হয়ে থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে নটোকর্ড আরো বিকশিত হয়ে শক্ত মেরুদণ্ডে রূপ নেয়। আর নার্ভকর্ড বিকশিত হয়ে দেহের উপরে বা সামনের দিকে সুগঠিত মস্তিষ্ক গঠন করে।

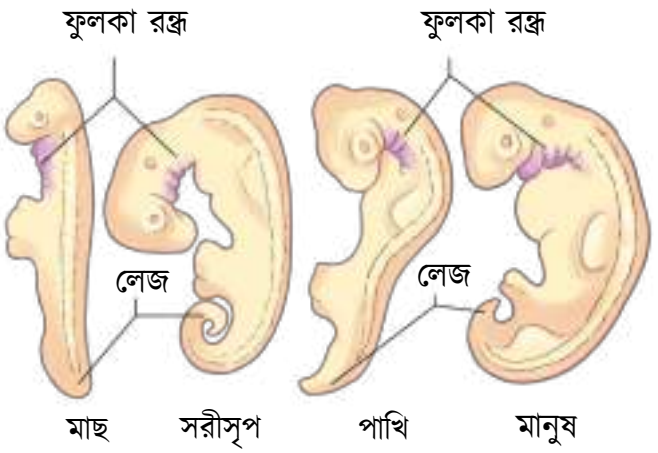

ভ্রূণ অবস্থায় মানুষ, পাখিসহ কর্ডাটা পর্বের সব প্রাণীরই লেজ ও ফুলকা রন্ধ্র রয়েছে।

কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণীর দেহে লেজ, এবং গলবিলের দুইপাশে ফুলকা রন্ধ্রের (Gill slits) উপস্থিতি দেখা যায়। এটা জেনে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ, কারণ মানুষ এবং অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে আমরা এর কোনোটাই দেখিনা। সত্যি বলতে কী, ভ্রূণ অবস্থায় যদি মানুষ, পাখিসহ কর্ডাটা পর্বের যে কোনো প্রাণীকে দেখো; দেখবে প্রত্যেকেরই লেজ ও ফুলকা রন্ধ্র রয়েছে। বেড়ে ওঠার একটা পর্যায়ে মানুষের ক্ষেত্রে এই ফুলকা রন্ধ্র পরিবর্তিত হয়ে কানের অংশ ও টনসিল গঠন করে। অন্যদিকে মাছের ক্ষেত্রে পানির নিচে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই অঙ্গ আরো সুগঠিত হয়ে ফুলকায় রূপ নেয়। লেজের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। ভ্রূণ অবস্থায় মানুষ, পাখি ইত্যাদি সকল প্রাণীর লেজ স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু মানুষসহ অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এগুলো লুপ্ত হয়ে যায়।

একনজরে এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেয়া যাক—

গঠন ও কোষের বিন্যাস : একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে সুগঠিত তন্ত্র গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে জটিল শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

দেহের প্রতিসাম্য : এদের দেহে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

দেহগহ্বর : সুগঠিত দেহগহ্বর থাকে।

দেহখণ্ডের উপস্থিতি : দেহখণ্ডের উপস্থিতি বিদ্যমান।

কঙ্কালতন্ত্রের ধরন : দেহের অভ্যন্তরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি অন্তঃকঙ্কাল থাকে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : সুগঠিত ও সম্পূর্ণ পরিপাকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র রয়েছে। জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এদের সবার দেহে লেজ ও ফুলকা গ্রন্থি দেখা যায়।

কর্ডাটা পর্বকে আবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপপর্বে ভাগ করা যায়:

ক. ইউরোকর্ডাটা (Urochordata):

এরা চলনক্ষম নয়, সামুদ্রিক উদ্ভিদের মতোই কোনো শক্ত বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে দেহকে আটকে রাখে। ফোলানো শরীর আর নলের মতো গঠন এদের পানি সংবহন করতে সাহায্য করে। লার্ভা অবস্থায় নটোকর্ড আর স্নায়ুরজ্জু থাকলেও পরিণত বয়সে এই দুটোই বিলুপ্ত হয়। এদের গঠন নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে। উদাহরণ : অ্যাসিডিয়া।

খ. সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata) :

সারাজীবনই এদের দেহে নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দেখতে মাছের মতো। এই উপপর্বের প্রাণীদের বিবর্তনের ধারায় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্বপুরুষের সবচেয়ে কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে ধারণা করা হয়। উদাহরণ: অ্যাম্ফিঅক্সাস।

গ. ভার্টিব্রাটা **(Vertebrata):**

এই উপ-পর্বের প্রাণীরাই মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। এদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এদের সুনির্দিষ্ট মস্তক থাকে, স্নায়ুরজ্জুর উন্নত রূপ হিসেবে স্পাইনাল কর্ড গঠিত হয় এবং স্পাইনাল কর্ডের সুরক্ষা দানের জন্য দৃঢ় মেরুদণ্ড থাকে। এছাড়া এদের মস্তিষ্ক শক্ত খুলির ভেতরে সুরক্ষিত থাকে, এবং স্পাইনাল কর্ডের সঙ্গে তা যুক্ত থাকে। অন্তঃকঙ্কাল এই প্রাণীদের চলনে সহায়তায় করে। গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের 7টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমাদের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই সাতটি শ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে। শ্রেণিগুলো হলো:

(1) চোয়ালবিহীন মাছ (Cyclostomata)

(2) অস্থিযুক্ত মাছ (Osteichthyes)

(3) কোমলাস্থিযুক্ত মাছ (Chondrichthyes)

(4) উভচর প্রাণী (Amphibia)

(5) সরীসৃপ (Reptilia)

(6) পাখি (Aves)

(7) স্তন্যপায়ী (Mammalia)

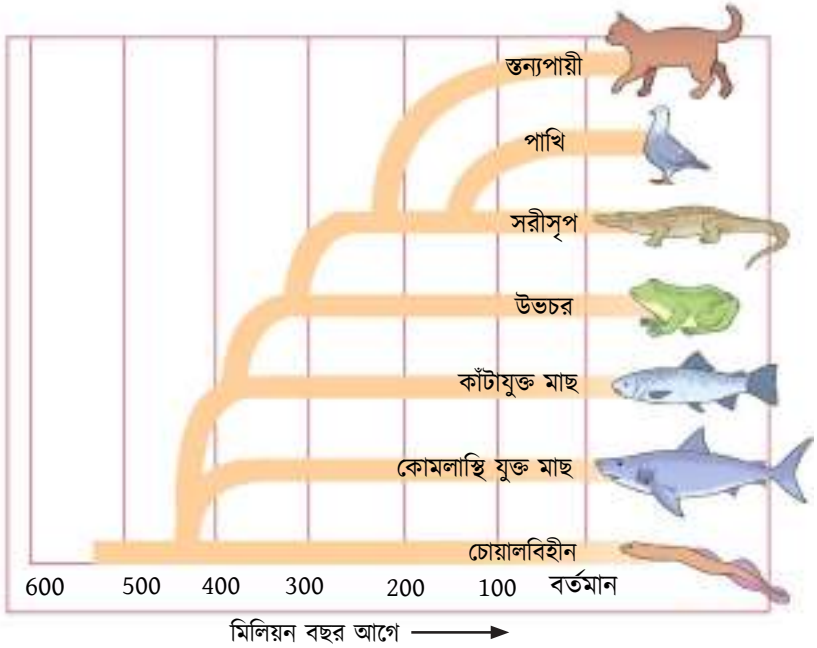

সময়ের সাথে বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব

10.3.3 স্তন্যপায়ী (Mammalia)

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্রেণিও বৈচিত্র্যময়। এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় হাজার স্তন্যপায়ী প্রাণী শনাক্ত হয়েছে। যেসব প্রাণী মায়ের দুধ পান করে জীবনধারণ করে তাদের সাধারণ অর্থে স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। এরা সন্তান প্রসব করে ও সন্তানকে দুধ পান করায়। স্তন্যপায়ী বা Mammal শব্দটা এসেছে mammary glands অর্থাৎ স্তনগ্রন্থি থেকে। তবে এরও ব্যতিক্রম আছে, যেমন—প্লাটিপাস ডিম পাড়ে, তবে এরাও সন্তানকে জন্মের পর দুধ খাওয়ায়। স্তন্যপায়ীদের শরীর লোমে আবৃত থাকে। সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী উষ্ণ রক্তের প্রাণী, এবং এদের হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। এদের ফুসফুস আছে।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তৃণভোজী, মাংসাশী, সর্বভুক সব ধরনের প্রাণীই ধরেছে। প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর মুখে দাঁত থাকে এই দাঁতের ধরন দেখেই প্রাণীটি খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শিকারী প্রাণী, যেমন বাঘ, বেড়াল, কুকুর, নেকড়ে এদের দাঁতের গঠন ভালো করে খেয়াল করে দেখো। অন্যদিকে গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি তৃণভোজীদের দাঁত লক্ষ করো, পার্থক্যটা সহজেই ধরতে পারবে।

প্লাটিপাস মেরুদণ্ডী প্রাণী হলেও ডিম পাড়ে।

যেহেতু উষ্ণ রক্তের প্রাণী, স্তন্যপায়ীদের শরীরে তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে চুল বা লোমের অস্তিত্ব দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ত্বকের নিচে চর্বির স্তরও এই প্রাণীদের শরীরে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই কারণে শীতের দেশের প্রাণীদের লক্ষ করলে দেখবে, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের লোম ঘন ও বড়ো হয়।

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতোই, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কঙ্কাল ও পেশিতন্ত্র থাকে এবং এদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রাণীরা চলাচল করে। এদের পেশির কোষগুলোতে যে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, সেখানেই এই চলনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়।

বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীরাই চার পায়ে চলাফেরা করে। তবে এখানেও ব্যতিক্রম আছে। বাদুড় স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু এদের সামনের দুই পা-ই আসলে বিবর্তিত হয়ে ডানায় রূপ নিয়েছে। আবার পানিতে বাস করা স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমি মাছ বা ডলফিনের কথা ভেবে দেখো। এদের সামনের পা দুইটি বিবর্তিত হয়ে পাখনায় রূপ নিয়েছে শুধু তাই নয়, কালক্রমে পেছনের পা দুইটির বিলুপ্তিও ঘটেছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সবচেয়ে জটিলভাবে বিবর্তিত প্রাণী বললে অত্যুক্তি হয় না। এদের মস্তিষ্ক জটিল বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এছাড়া এদের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় থাকার কারণে এরা চারপাশের পরিবেশে থেকে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ ও সাড়া প্রদান করতে সক্ষম। পরবর্তী সময়ে তোমরা এই প্রাণীদের সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানবে।

10.3.4 কীটপতঙ্গ

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের বিচরণ। প্রায় 40 থেকে 45 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আগমন ঘটে। এরপর বড়ো একটা সময়জুড়ে পৃথিবীর প্রায় সব প্রতিবেশেই এদের আধিপত্য ছিল। ওইসময় কীটপতঙ্গ আকারেও বেশ বড়ো ছিল, এক একটি গঙ্গাফড়িং ছিল গাংচিল পাখির সমান। কালক্রমে বিবর্তনের ধারায় পৃথবীতে আবির্ভূত হয় পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। একসঙ্গে কমতে থাকে কীটপতঙ্গের প্রভাব। তবে আকারে ছোটোহয়ে গেলেও প্রজাতিবৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্যে এদের জুড়ি নেই। বর্তমান সময়েও আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রজাতির কীটপতঙ্গ। প্রাণিজগতে সবচেয়ে বেশি প্রজাতি আছে কীটপতঙ্গ শ্রেণিতে, পৃথিবীতে আবিষ্কৃত প্রাণিজগতের প্রায় 80 শতাংশই কীটপতঙ্গ। এখন পর্যন্ত এদের প্রায় 10 লক্ষ প্রজাতির বর্ণনা হয়েছে।

কীটপতঙ্গের দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত: মাথা, বক্ষদেশ ও উদর। কাইটিন দ্বারা গঠিত শক্ত বহিঃকঙ্কালে দেহ আবৃত। বহিঃকঙ্কাল দেহকে সুরক্ষা করে; এটি বিভিন্ন পেশির জন্য সংযোগ বিন্দু হিসেবেও কাজ করে। বৃদ্ধির সময় নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বহিঃকঙ্কালের খোলস বদলায়। কীটপতঙ্গের বিশেষত্ব হচ্ছে এদের মাত্র তিন জোড়া বক্ষদেশীয় পা এবং অধিকাংশ কীটপতঙ্গের দুই জোড়া বক্ষদেশীয় ডানা রয়েছে। কীটপতঙ্গ ব্যাপক বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আকারের দিক থেকে কোনো কোনোটি এক মিলিমিটারের কম, আবার বড়োদের দৈর্ঘ্য বা পাখার বিস্তৃতি কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এদের জীবনকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে বহু বছর পর্যন্ত হতে পারে; এরা বিচ্ছিন্ন বা সমাজবদ্ধভাবে থাকতে

পারে। কীটপতঙ্গ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী ও জৈব পদার্থ খেয়ে জীবন ধারণ করে; খাদ্য উৎসের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মিথোজীবিতা থেকে পরজীবিতা বা শিকার পর্যন্ত হতে পারে। কীটপতঙ্গের রয়েছে সুগঠিত পরিপাক, রক্তসংবহন, শ্বসন, স্নায়ু ও প্রজননতন্ত্র। পরিপাককৃত খাদ্য শোষিত হয় প্রধানত খাদ্যনালির মধ্য অংশে।

কীটপতঙ্গ ছোটোআকারের প্রাণী হলেও এদের জীবনচক্র বেশ জটিল এবং বৈচিত্র্যময়। প্রায় সব ধরনের কীটপতঙ্গ এদের জীবনচক্রে 3 বা 4টি ধাপ অতিক্রম করে। প্রজাপতি তার জীবদ্দশায় 4টি ধাপ সম্পন্ন করে। প্রথমে স্ত্রী প্রজাপতি ডিম দেয়, এরপর ডিম থেকে লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা এবং পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিতে পরিণত হয়। ঘাসফড়িংজাতীয় পতঙ্গ জীবনে ডিম, নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ এ 3টি ধাপ সম্পন্ন করে। কীটপতঙ্গের জীবনচক্রের এ ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় রূপান্তর। অনেক কীটপতঙ্গ এককভাবে জীবনযাপন করলেও কোনো কোনো পতঙ্গ দলবদ্ধ হয়ে সামাজিক জীবনযাপন করে। এদের দলবদ্ধ বসবাস অনেকটা মানুষের সামাজিক জীবনযাপনের মতোই। কীটপতঙ্গের সামাজিক জীবনে কাজের দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। প্রতিটি দলের মধ্যে থাকে একটা রানী, কয়েকটা পুরুষ আর থাকে অসংখ্য শ্রমিক। সামাজিক জীবনযাপনের ফলে এদের মধ্যে এক ধরনের শ্রমবিভাগ দেখা যায়। শ্রমিকরা খাবার সংগ্রহ এবং বাসস্থানের দেখাশোনাসহ সব ধরনের কাজ করে থাকে। রানি ও পুরুষ মূলত বংশবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

ছোটো পিঁপড়া থেকে শুরু করে ঘরের কোণের আরশোলা এবং বাহারি প্রজাপতি ও ঘাসফড়িং সবই কীটপতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। মাটি থেকে শুরু করে গাছপালা, জলাশয়, ফসলের মাঠ এমনকি আমাদের বসতবাড়িতেও এদের দেখা যায়। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এ প্রাণীগুলো হয়ে উঠেছে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝে যে আন্তঃসম্পর্ক ও খাদ্যজাল গড়ে উঠেছে তা কীটপতঙ্গ ছাড়া ভাবাই যায় না।

কীটপতঙ্গকে আমরা সাধারণত ক্ষতিকর হিসেবে জানলেও প্রকৃতিতে রয়েছে এদের অপরিসীম উপকারী ভূমিকা। উদ্ভিদের পরাগায়ন থেকে শুরু করে প্রতিবেশে সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা পায় কীটপতঙ্গের মাধ্যমে। অন্য প্রাণীর খাদ্য জোগান দিতেও রয়েছে কীটপতঙ্গের ভূমিকা। এই পোকামাকড় খেয়েই কিন্তু পাখি, বাদুড় এবং ছোট আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বেঁচে থাকে। সুতরাং পোকামাকড় না থাকলে পাখি, বাদুড়, ব্যাঙ এবং মিঠা পানির মাছও অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারা নিজেরাই কখনো হয় অন্যের খাদ্য, কখনো বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানের মাধ্যমে তারা হয়ে উঠে বাস্তুতন্ত্র বা ecosytem-এর সেবক। কোনো কোনো পতঙ্গ ক্ষতিকর হলেও অধিকাংশ প্রজাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের উপকার করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মৌমাছি, প্রজাপতি, রেশমকীট, ঘাসফড়িং ইত্যাদি। মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে এবং মৌচাকে জমা করে। এ মধু আর মোম অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এছাড়া মৌমাছি বিভিন্ন ফসলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেশমকীট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পতঙ্গ। রেশমকীট পালনের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয় রেশম সুতা যা থেকে মূল্যবান বস্ত্রসামগ্রী তৈরি হয়। কীটপতঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো প্রজাপতি ও ঘাসফড়িং। রংবেরঙের প্রজাপতির ওড়াউড়ি নিমেষেই মুগ্ধ করে মানুষকে।

শুধু সৌন্দর্য আর বর্ণিল বাহার নয়, ফুলে ফুলে ঘুরে পরাগায়নের মাধ্যমে পরিবেশের জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এদের ভূমিকা অপরিসীম। পতঙ্গের আরেকটি সুপরিচিত দল পিঁপড়া। এরা মাটির গর্তে, গাছের কোটরে অথবা বিভিন্ন আসবাবপত্রের ফাঁকে বাসা বাঁধে। এরা খুবই সামাজিক। সারি বেঁধে চলাচল এবং খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের বাড়ি ফেরা ও খাবার সংগ্রহের জন্য সূর্যালোকের কৌণিকতা নিরূপণ করে চলে। এরা আমাদের উচ্ছিষ্ট খাবার এবং অন্য মৃত পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে।

10.৫ প্রাণিজগতে মানুষের অবস্থান

জীববিজ্ঞানীরা জীবজগতকে বিভিন্ন প্রজাতিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। যেসব প্রাণী নিজেদের মধ্যে যৌনমিলনের মাধ্যমে এমন উত্তরসূরির জন্ম দিতে পারে যারা প্রজনন করতে পারে, তাদেরকে একই 'প্রজাতি'র (species) অন্তর্ভূত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেসব প্রজাতি অতীতের একটি সাধারণ পূর্বসূরি থেকে উৎপত্তি লাভ করে কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে তাদেরকে 'গণ' (Genus) নামক দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাঘ, সিংহ, চিতা এবং জাগুয়ার প্রত্যেকে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী হলেও প্রত্যেকে 'প্যানথেরা' (Panthera) গণের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসের পদ্ধতি অনুসরণ করে জীববিজ্ঞানীরা প্রতিটি জীবকেই একটি দ্বিপদী ল্যাটিন নাম দিয়েছেন; যার প্রথমটি নির্দেশ করে গণ, পরেরটি প্রজাতি। উদাহরণস্বরূপ, সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'প্যানথেরা লিও' (*Panthera leo*), যেখানে '*Panthera*' ও '*leo*' যথাক্রমে গণ ও প্রজাতিকে নির্দেশ করছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Homo sapiens*. এখানে '*Homo*'(মানব) হলো গণের নাম এবং '*sapiens*' (জ্ঞানী) হলো প্রজাতি।

মানুষের নিকটবর্তী প্রজাতির মাঝে শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং ওরাংওটাং এখনও বেঁচে আছে। এরা সকলেই '*Homo*' গণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী মানুষ হলো Chordata পর্বের, Vertebrata উপপর্বের অন্তর্গত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্রেণি Mammalia-এর Primate বর্গের Hominidae গোত্রের *Homo* গণের *sapiens* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের শ্রেণিবিন্যাস :

পর্ব: Chordata

উপপর্ব: Vertebrata

শ্রেণি: Mammalia

বর্গ: Primate

গোত্র: Hominidae

গণ: *Homo*

প্রজাতি: *sapiens*